# কুশিয়ারা পানি চুক্তিঃ একটি মাইলফলক

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

জাতিসংঘ কনভেনশন ১৯৯৭ এর সংজ্ঞা অনুসারে পৃথিবীর ২৬৩ টি নদী ও পানিপ্রবাহকে 'আর্ন্তজাতিক পানিপ্রবাহ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।কনভেনশনের ২(৬) ধারায় বলা হয়েছে 'আর্ন্তজাতিক পানিপ্রবাহ'হচ্ছে যে পানিপ্রবাহের অংশবিশেষ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত।১৯৯২ সালের হেলসিংকি চুক্তির ১(১)ধারায় এ ধরনের পানিপ্রবাহের সংজ্ঞায় 'আন্ত:সীমান্ত জলরাশি'বলতে ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি যা দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে প্রবাহিত। এসব পানি প্রবাহ দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে কোনো একটি দেশসংলগ্ন সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। ভারত,চীন ও মিয়নমারে উৎপত্তি হয়ে বিপুল সংখ্যক আর্ন্তজাতিক নদী বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।আন্তর্জাতিক পানি প্রবাহ কনভেনশনের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি দেশ আন্তর্জাতিক পানি প্রবাহ থেকে পানি ব্যবহারের সময় পাশ্ববর্তী দেশ যাতে কোনোরূপ ক্ষতির সম্মুখীন না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশের ছোটো বড়ো ৭০০ টি নদীর মধ্যে ৫৭ টি নদীই আন্তর্জাতিক,যার ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মিয়ানমার থেকে।ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করা ৫৪টি নদীর মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, ভারত-নেপাল থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পানির পরিমাণ বার্ষিক গড়ে ১০ লাখ ৭৩ হাজার ১৪৫ মিলিয়ন ঘনমিটার। অভ্যন্তরীণ বৃষ্টিপাত থেকে বার্ষিক ২ লাখ ৫০ হাজার ৪০১ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি বাংলাদেশের নদী-নালা-খাল-বিল জলাশয়গুলোতে জমা হয়ে থাকে। বরাক-মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও গঙ্গা-পদ্মা নদীর মধ্য দিয়ে যথাক্রমে ১৫০ বিলিয়ন ঘনমিটার,৭০০ বিলিয়ন ঘনমিটার ও ৫০০ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হয়।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অভিন্ন নদী উভয় দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বেশকিছু নদীর পানি বন্টন নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের দরকষাকষি চলে আসছে।আর্ন্তজাতিক পানিপ্রবাহ হতে যথাযথ পানি প্রত্যারের জন্য এঅঞ্চলের পাঁচটি নদী প্রধান দেশকে একসঙ্গে বসে বরাক,কুশিয়ারা ও সুরমা এই তিনটি নদী পরিচালনা করা অপরিহার্য।কারন এটি একটি নদী ব্যবস্থাপনার অংশ। বাংলাদেশের ভেতরের ২৫টি নদীর সঙ্গে তিস্তা নদীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি নদীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নদী নিয়ে মহাপরিকল্পনার পাশাপাশি নদী পাড়ের মানুষ ও পরিবেশের কথা চিন্তা করে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক ব্যবস্থাপনা জরুরি।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যৌথ নদী কমিশনের তালিকার বাইরেও ৪২টি নদ-নদীর মধ্যে ৩৭ টি নদী সরাসরি ভারতের সীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।এই নদীগুলোর পতিত মুখ বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই।শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদী কৃষি জমিকে আবাদের আওতায় আনতে ২০০১সালে প্রায় ৩শ'কোটি টাকার আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়।এই প্রকল্পের আওতায় ১০ হাজার ৬শ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আনার লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয় প্রায় ১৪৬ কি:মি:বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ।খনন করা হয় সাড়ে ৪৮ কি:মি:নিষ্কাশন খাল ও সাড়ে ৩৯ কি:মি:সেচ খাল।২০১১সালে প্রকল্পের অধীনে সিলেটের রহিমপুর খাল খনন ও পাম্প হাউস স্থাপনের কাজ শুরু করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। ২০১৬ সালে সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ'র আপত্তির কারনে রহিমপুর খাল ও কুশিয়ারা নদীর সংযোগস্থল খনন করতে পারেনি। ফলে বন্ধ ছিল প্রকল্পটি। প্রায় ৬ বছর আগে পাম্প হাউস ও খালের উন্নয়নকাজ শেষ হয়েছিল। কিন্তু খালের উৎসমুখ খনন করতে না পারায় খালের অনেকাংশ ভরাট হয়ে গেছে।ভারতের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় কুশিয়ারা নদী থেকে পানি উত্তোলন করতে পারবে বাংলাদেশ।এখন দ্রুততম সময়ে আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করে বাঁধ অপসারণ ও পাম্প হাউস চালু করা যাবে।

কুশিয়ারা নদীকে কেন্দ্র করে ২০২২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা চুক্তি।এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সিলেটে কুশিয়ারা নদীর রহিমপুর খাল পয়েন্টে ১৫৩ কিউসেক পানি উত্তোলন করবে।শুষ্ক মৌসুমে,নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কুশিয়ারা নদীর বাংলাদেশ অংশে গড়ে ৫,২৯৫ থেকে ১৭,৬৫০ কিউসেক পানি প্রবাহিত হয়।সেই তুলনায় ১৫৩ কিউসেক পানি নিতান্তই সামান্য পরিমাণ (প্রবাহিত পানির ১ থেকে ৩ শতাংশ)।ত্রিপুরার সাব্রুমের জন্য সুপেয় পানির জন্য ১ দশমিক ৮২ কিউসেক পানি উত্তোলন করবে ভারত।চুক্তির ফলে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জকিগঞ্জ উপজেলায় শুষ্ক মৌসুমে চাষাবাদে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন।

রহিমপুর খালটিই এখন কুশিয়ারা থেকে পানি আনার একমাত্র মাধ্যম। রহিমপুর পয়েন্ট এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে ওই জায়গাটি অনেক উঁচু।যার কারণে বর্ষার মৌসুম বাদে উচ্চতার কারণে শীতকালে বা শুষ্ক মৌসুমে,আমন ধান চাষের সময় এমনকি বর্ষার মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হলে,পানির লেভেল যখন কমতে থাকে তখন কুশিয়ারা থেকে রহিমপুর খালে আর পানি প্রবেশ করতে পারে না।যার ফলে আশপাশের ৭টি উপজেলায় সেচের জন্য কোন পানি পাওয়া যায়না এবং শুষ্ক মৌসুমে পুরো অঞ্চলটিতে কোন কৃষি কাজ করা যায়না।সেচের পানির অভাবে বছরের বেশিরভাগ সময় ওই পুরো অঞ্চলে কৃষি জমি পুরোপুরি ফসল শূন্য হয়ে থাকে।

প্রাচীন কালের স্বাধীন রাজ্য মণিপুরের আঙ্গামীনাগা পাহাড়ের ৩০০ কি.মি.উঁচু স্থান থেকে বরাক নদীর উৎপত্তি। উৎপত্তিস্থান হতে ৪৯১ কি.মি.অতিক্রম করে সিলেটের সীমান্তে এসে জকিগঞ্জ উপজেলার অমলশীদ পয়েন্টে ভারতের মণিপুর রাজ্যের মাও সাংসাং থেকে বরাক নদী বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উৎপত্তি।এই পয়েন্টের আন্তর্জাতিক সীমান্ত ধরে

বেশকিছু এলাকা অতিক্রম করে বিয়ানীবাজার উপজেলায় বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করেছে।কুশিয়ারার উৎসমুখ থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে শরীফগঞ্জ বাজারের পাশেই কুশিয়ারা নদী থেকে রহিমপুর খালটির উৎপত্তি। প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাকৃতিক খালটি আরও অনেক খালের উৎপত্তিস্থল।কুশিয়ারা নদী থেকে এই খাল দিয়ে প্রবাহিত পানি কয়েক শতাব্দী ধরে জকিগঞ্জ উপজেলার বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি ও হাওরাঞ্চল ছাড়াও কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজার উপজেলার কিছু অংশের পানি প্রবাহের অন্যতম উৎস।

কুশিয়ারার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬১ কি:মি:,গড় প্রস্থ ২৫০ মিটার এবং বর্ষা মৌসুমে গড় গভীরতা প্রায় ১০ মিটার। কুশিয়ারা নদী একদিন বিপুল ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল। শুশুক,ইলিশসহ বহু প্রজাতির মাছ ছিল। উত্তাল স্রোতে চলত পাল তোলা নৌকা।লঞ্চ,স্টিমার ও মালবাহী জাহাজ চলত সারাবছর।ঘাটে ঘাটে ছিল নৌকার ভিড়।ছিল কুলি-শ্রমিকদের কোলাহল।কুশিয়ারা নদীকে কেন্দ্র করে বালাগঞ্জ বাজার,শেরপুর ঘাট ও ফেঞ্চুগঞ্জ বাজার ছিল সদা কর্মতৎপর সচল নৌবন্দর।বিস্তীর্ণ জনপদে কুশিয়ারা নদীর সেচের পানিতে হতো চাষাবাদ। অনেক পরিবারের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল এই কুশিয়ারা।

উৎসমুখে কুশিয়ারা নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় গত কয়েক যুগ ধরে রহিমপুর খাল শুকনো মৌসুমে পানিশূন্য হয়ে পড়ে। এর কারণে অন্তত ১০ হাজার হেক্টর জমিতে রবিশস্য ও আরও বিস্তীর্ণ হাওরাঞ্চলে বোরো চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছিল। প্রত্যাহারকৃত এ পানি মূলত রহিমপুর খাল প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেটের ৭টি উপজেলার কৃষিকাজে ব্যবহৃত হবে। এ সেচ প্রকল্পের প্রায় ১০ হাজার ৬শ হেক্টর ভূমি বোরো ধান চাষ ও মৌসুমী ফসলের আওতায় আসবে। এর ফলে দেশের বোরো ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, এই ধান মূলত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে চাষ করা হয়। আর এই সময়েই পানি সঙ্কট সব থেকে বেশি দেখা যায়। এসব জমিতে ধান ও অন্যান্য শীতকালীন শাকসবজি চাষ শুরু হলে এ অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।উৎপাদিত শাকসবজি যার ভারতের ঠিক পার্শ্ববর্তী সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং বিদেশেও প্রচুর বাজার সম্ভাবনা রয়েছে।এছাড়াও স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ফলে এখানকার বাজারগুলোতে প্রয়োজনীয় কৃষিদ্রব্যাদি দূর থেকে পরিবহনের খরচ কমে আসবে।

সারাবছর পানির প্রবাহ বজায় থাকার ফলে খালগুলোর নাব্যতা ঠিক থাকবে,যা বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। হাওর ও বিলে বাড়বে মৎস্য উৎপাদন।কুশিয়ারার পানি কৃষি জমিতে সেচের কাজে ব্যবহার করা হবে। যার ফলে তিন মৌসুমেই ধান চাষ করতে পারবেন জকিগঞ্জ,কানাইঘাট ও বিয়ানীবাজারের কৃষকের।জলাশয়ে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে বাড়বে মৎস্য উৎপাদন।ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি আর ভালো পবিবেশেই উন্নত জীবন।কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করেই স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এক জনসভায় ঘোষণা দিয়েছিলেন ‘মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ।দেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় মৎস্য খাতও একটি গর্বিত অংশীদার। এছাড়া মৎস্য চাষেও সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন হবে।যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে উপজেলার অর্থনীতিতে।রহিমপুর খালের মাধ্যমে কুশিয়ারার অতিরিক্ত পানিই সিলেটের কৃষিক্ষেত্র ও বাগানে সেচের জন্য পানির স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়।

বাংলাদেশ-ভারত আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে রাজনীতি আছে, অর্থনীতি আছে এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলোর পাশাপাশি আছে সামাজিক,সাংস্কৃতিক,শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত লেনদেনজনিত বহুবিধ বিষয়াবলি। সবকিছুকে ছাপিয়ে কুশিয়ার নদীর ইস্যুটি সামনে চলে আসায় 'ওয়াটার পলিটিক্স'বা'পানি রাজনীতি'র প্রসঙ্গটিই যেন সবার সামনে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।কুশিয়ারার পানি প্রত্যাহার চুক্তি এ অঞ্চলের মানুষের কৃষি ও জীবিকার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ একইভাবে এ চুক্তি বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক।এ চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে ভারত বাংলাদেশের সাথে কোনো পানিচুক্তিতে সম্মত হয়েছে।ফলে এটিকে একটি মাইলফলক বিবেচনা করে তিস্তাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অভিন্ন নদীগুলোর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ভারতের সাথে ফলপ্রসু কূটনৈতিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া।

#

লেখক:সিনিয়র তথ্য অফিসার (জনসংযোগ কর্মকর্তা) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

পিআইডি ফিচার